ফরিদ আহমদ দুলাল

বাংলার লোকউৎসব : সাহিত্যচর্চা

বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। প্রায় প্রতিটি পার্বণের সাথে যুক্ত আছে উৎসবের যোগ। বাঙালির এইসব উৎসবের মধ্যে আছে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমাসহ অন্যান্য উৎসব; আর সামাজিক উৎসবের মধ্যে আছে নববর্ষ, লোকমেলা, বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানাদি। এসব উৎসব অনুষ্ঠানের যেমন আছে আবহমান বাংলার নানান লোক আয়োজন, তেমনি আছে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন আয়োজন। আবহমান কালের আয়োজনের সাথে আধুনিক সময়ের নাগরিক জীবনের রয়েছে বিস্তর ফারাক। বাংলার বিভিন্ন উৎসব যেমন ছিল লোক-সাহিত্যের নানান উপস্থাপন, তেমনি নাগরিক সমাজে আধুনিক কালে আছে উৎসবকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা। বাঙালির উৎসবের সাহিত্য নিয়েই বর্তমান রচনা উপস্থাপনের প্রয়াস। যৌক্তিক কারণেই আলোচনা লোকজীবন থেকে শুরু করা হবে।

প্রবন্ধ

ধর্মীয় আচারভিত্তিক উৎসব-অনুষ্ঠান : বৃহত্তর বাংলার গ্রামগঞ্জে নানান ধর্মীয় অনুষঙ্গের হাত ধরে আয়োজিত হয় বেশকিছু সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, যেগুলো একই সাথে ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানও। কোনো কোনো অনুষ্ঠান ধর্মীয় আবহকে অতিক্রম করে পূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ লাভ করে।

হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ইত্যাদি নানান ধর্মীয় উৎসবকে ঘিরে আমাদের সমাজে যেসব সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান প্রচলিত ও পালিত হয়ে আসছে তার সম্পর্কে সামান্য দৃষ্টিপাত করা যাক।

বর্ষ পরিক্রমায় উৎসব-অনুষ্ঠান : মানব জীবনচক্রের নানা পর্যায়ে আমাদের সমাজে যেমন উৎসব-অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত, তেমনি প্রকৃতি ও বর্ষপরিক্রমার নানান বাঁকে আছে উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন। বাঙালির বর্ষপরিক্রমায় শুধু খাদ্যতালিকার বৈচিত্র্য পাবো আমরা নিচের ছড়াটিতে—

চৈত্রে গিমা তিতা
বৈশাখে নালিতা মিঠা
জ্যৈষ্ঠে কৈ
আষাঢ়ে ভোর পান্তা শ্রাবণে দৈ
ভাদ্রে তালের পিঠা আশ্বিনে শসা মিঠা
কার্তিকে ওল অঘ্রাণে খলসে মাছের ঝোল
পৌষে কাঞ্জি মাঘে তেল ফাল্গুনে গুড়-আদা-বেল।

বাঙালির বছর ধরে চলে উৎসব-অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠানে সবাই মিলিত হয় প্রাণের আবেগে। ষড়ঋতুর বর্ষ পরিক্রমায় ঋতুচক্রের সাথে সঙ্গতি রেখে লোকবাংলার যেসব আয়োজন সুদীর্ঘ কাল ধরে আমাদের গ্রামগঞ্জে নিয়মিত আয়োজন হয়ে আসছে এবার সেদিকে তাকানো যাক।

নববর্ষ : বাঙালির বর্ষপরিক্রমার প্রথম এবং প্রধান উৎসব 'নববর্ষবরণ'। বঙ্গাব্দের সূচনায় বাঙালি নতুন বছরকে বরণ করে নিতে আয়োজন করে নববর্ষবরণ উৎসব। আমাদের সমাজের মানুষের ধারণা বছরের প্রথম দিন ভালো কাটলে সারা বছর ভালো কাটবে। নববর্ষে একজন অন্যের বাড়িতে গেলে সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে আপ্যায়িত করে, মিষ্টিমুখ করায় এবং পরস্পরের সাথে কোলাকুলি করে। নববর্ষ উপলক্ষে গ্রামে কবাডি খেলা, দাড়িয়াবাঁধা খেলা, লাঠিখেলা, ষাঁড়ের লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি খেলার আয়োজন হয়। গৃহস্থ বাড়িতে গৃহপালিত প্রাণীদের স্নান করানো হয়, কলকিতে রঙ লাগিয়ে গরু-ছাগলের গায়ে নকশা আঁকা হয় এবং ঘর-দুয়ার-উঠোন-আঙিনা পরিষ্কার পরিপাটি করা হয়। নববর্ষ উপলক্ষে ব্যবসায়ীরা হালখাতার আয়োজন করে। হালখাতার প্রস্তুতি চলে দু'দিন আগে থেকেই। দোকানপাট দু'দিন আগে থেকেই ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করা হয় এবং দোকানের মালামাল পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি পুনর্মূল্যায়িতও হয় নববর্ষে। হালখাতার অনুষ্ঠানকে গ্রামে বলা হয় পুণ্যি। পুণ্যি অনুষ্ঠানে নিয়মিত ক্রেতাদের মিষ্টিমুখ করানো হয়।

বর্ষপরিক্রমায় অন্যান্য আয়োজন : বর্ষবরণের আয়োজন ছাড়াও বর্ষপরিক্রমায় দেশের নানা প্রান্তে আছে নানা আয়োজন। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে লোকবাংলার প্রতিটি আয়োজনের সাথে কৃষির একটা সংযোগ আছে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গ্রামে গ্রামে মানুষ আম কাঁঠাল দুধ খৈ নিয়ে আত্মীয় বাড়ি যায়, বিশেষত মেয়ের বাড়ি যায় এবং নিজেদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে গ্রামে গ্রামে ভরা নদীতে আয়োজন হয় নৌকাবাইচ; এই প্রতিযোগিতা কোনো কোনো ব্যক্তি এবং বংশের জন্য সম্মানের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাদ্র মাসে মেয়েরা বাপের বাড়ি নাইওর যায়। দীর্ঘদিন পর মেয়ের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত হয় সামাজিক নানান উৎসব-অনুষ্ঠান। ভাদ্রে তালের পিঠা, কার্তিক শেষে মশা-মাছি তাড়ানো এবং নতুন ফসলের মঙ্গল কামনা। কার্তিকের শেষ দিন বাড়ি থেকে অশুভ তাড়াতে খড়ের 'বুইন্দা'য় আগুন দিয়ে বাড়ির চারপাশে প্রদক্ষিণ করে খড়ের 'বুইন্দা'টি নিজের ধানি জমিতে পুঁতে দেয়া হয়। বুইন্দা নিয়ে প্রদক্ষিণের সময় চিৎকার করে বলা হয়— 'বালা আয়ে বুড়া যায় মশা-মাছির মুখ পুড়া যায়'। মানুষের ধারণা এই ধোঁয়ার মাধ্যমে মশা-মাছি-অশুভ পতঙ্গ বিনাশ হবে এবং ক্ষেতে অধিক শস্য ফলবে। অঘ্রাণে নতুন ধান ওঠে কৃষকের ঘরে ঘরে, চলে নবান্নের উৎসব। রাতভর ঢেঁকিতে ধানভানা, আর ধানভানার গীত। ঢেঁকিতে ধান ভানার দৃশ্যটি এখন অবশ্য নিতান্তই বিরল। পৌষে পিঠা-পায়েশ তৈরির ধুম। মাঘে শীত সকালে নাড়ার আগুনে নিজেদের সেঁকে নেয়া। চৈত্রে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা— বান্নির মেলা-চরকগাছ ইত্যাদি। শীতের রাতে গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে বসে কিসসাপালা, পুঁথিপাঠ, গাইনের গীত আর কীর্তনের আসর। সব মিলিয়ে আনন্দ-বেদনায় কেটে যায় আমাদের গ্রামবাংলার জীবনের প্রাত্যহিকতা। আর এসব উৎসবের পরতে পরতে থাকে সুর এবং গীত। লোকগীতির সারিগান প্রধানত নৌকাবাইচের সাথে সম্পর্কিত। অসংখ্য সারিগানের উদাহরণ দেয়া যায় সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে এখানে একটিমাত্র সারিগানের উল্লেখ করছি—

ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ, রূপের বাহার গো
বাহার গো ঝাড়িয়া বান্ধিও মাথার কেশ॥
আউলা চুলের বাউলা খোঁপা বাহার তাতে নাই
বেণীর খোঁপায় ফুল গুঞ্জিলে পাগল হইয়া যাই।
রূপের বাহার গো...
জল ভরিতে না লয় মনে প্রাণ সই গো
কেমনে যাব যমুনারি ঘাটে॥
রাধিকা যমুনায় যায় গো হেলিয়া ঢলিয়া।
পাছে পাছে কানু চলে মুরলী বাজাইয়া॥ (প্রাণ সই গো)
চলতে গেলে বাজে রাধার চরণে মেথুর
তার মধ্যে কালা মেঘে আসমান করলো ঘোর॥
কেমনে ভরে জল রাধা মেঘে হইল আন্ধি
মাডির কলসি ভাইঙ্গা গেল হাতে রইল কান্দি॥

লোকজ উৎসব-অনুষ্ঠান : নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো, গুটিখেলা, চৈত্র-সংক্রান্তি, নববর্ষ, অষ্টমী স্নান, রথযাত্রা, দোলপূর্ণিমা, চরক পূজা ইত্যাদি ছাড়াও মানব জীবনচক্রের নানান আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মীয় জীবনে নানান সামাজিক ধর্মীয় ও লোকজ উৎসব ঘিরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের বিভিন্ন সময় যেসব উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, সেসব প্রতিটি উৎসব-অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছে লোকজ জীবনের নানান অনুষঙ্গ। সেই সব সামাজিক-ধর্মীয় ও লোকজ উৎসব-অনুষ্ঠানের উপর এখন সামান্য আলোকপাতের প্রয়াস চালাবো। সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোর বেশ কয়েকটির উৎসধর্ম; সুতরাং একই সাথে আমাদের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো কখনো কখনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বটে। সঙ্গত কারণেই সামাজিক ও ধর্মীয় গণ্ডির বিভাজনটি সতর্কতার সাথে করা চাই। পাছে কখনো অনবধানতাবশত সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানগুলো একাকার না হয়ে যায়। লক্ষণীয় দিক হচ্ছে, আমাদের সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানগুলো যে কোনো সূত্রেই প্রাপ্ত হই, হোক তা প্রাকৃতিক সূত্র, জীবন পরিক্রমার সূত্র অথবা ধর্মীয় সূত্র; আমাদের লোকজ সকল উৎসব-অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহণ আয়োজনগুলোকে সর্বজনীন করে তোলে। যে কারণে আমাদের সমাজে দু'চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও লোকজ জীবনে কোথাও ধর্মীয় সম্প্রীতির সংকট দেখা দেয়নি।

মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব : মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। ঈদকে ঘিরে মুসলিম সমাজে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। ঈদ উপলক্ষে প্রতিটি পরিবারে ঘটে পুনর্মিলন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ঈদের দিন সর্বস্তরের মানুষ নতুন জামা-কাপড় পরে পরস্পরের বাড়িতে বেড়াতে যায় এবং প্রত্যেকের বাড়িতেই থাকে নানান উপাদেয় আপ্যায়ন। বছরে দুবার অনুষ্ঠিত ঈদোৎসবের প্রথমটি ঈদুল ফিতর এবং দ্বিতীয়টি ঈদুল আজহা। এক মাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের উৎসব সবাইকে ছুঁয়ে যায়। ঈদুল আজহায় পশু কুরবানির যে বিধান তাতে আগ্রহের সাথে সামর্থ্যবানরা অংশগ্রহণ করে। আগে ঈদের দিন গ্রামগঞ্জে পালাগান, ঢপযাত্রা, ধামাইল গান, কিসসাপালা, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন হতো। সাধারণত ঈদুল ফিতরে এসবই ছিল প্রধান আনুষ্ঠানিকতা। একসময় বাজি পোড়ানো, পটকা ফোটানোর রেওয়াজ ছিল।

হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব : হিন্দুদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনেকগুলোই আমাদের সমাজে সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানের মর্যাদা পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখ করতে পারি দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, রথযাত্রা-রথের মেলা, অষ্টমীস্নান-অষ্টমীর মেলা, কালিপূজা, ভাইফোঁটা, ঝুলনযাত্রা, দোল-পূর্ণিমা, জামাইষষ্টি ইত্যাদি। হিন্দু সমাজে সুৎমার্গের আধিক্য ও সংকীর্ণতা থাকলেও কিছু নিয়মনীতি মেনে চললে যে কোনো উৎসবে সর্ব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণে বাধা ছিল না। বিভিন্ন পূজায় ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের প্রতিমা দেখতে বেরোনো, সবার মাঝে পূজার প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি কোনো কাজেই বাধা ছিল না। একসময় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সরস্বতি পূজা হতো এবং সে পূজা হিন্দু-মুসলমান মিলেই আয়োজন করতো। ভাইফোঁটা অনুষ্ঠানে মেয়েরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বলতো, 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা, যমকে দেয় যমুনা ফোঁটা আমি দেই আমার ভাইকে ফোঁটা'। একসময় অনেক হিন্দু বোনই মুসলমান ভাইকে ফোঁটা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে; যদিও সেসব দৃশ্য আজ নিতান্তই দুর্লভ।

গ্রামীণ খেলা : অধিকাংশ গ্রামীণ খেলার জন্য খেলোয়াড় এবং একখণ্ড ভূমিই যথেষ্ট। যেমন থাপ্পি খেলায় ৩-৫ টুকরা ইট বা পাথর, ডাংগুলি খেলায় একটি এক হাত লম্বা লাঠি (ডাং) এবং আড়াই ইঞ্চি কাঠের টুকরা (গুটি), এক্কাদোক্কা ও কুতকুত খেলায় একটি চাড়া (ডেগ্গি) ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। এসব খেলা ছাড়াও গ্রামীণ জীবনে পটের খেলা (জুয়া খেলা), ষাঁড়ের লড়াই, নৌকাবাইচ, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো ইত্যাদি খেলা প্রচলিত ছিল; এসব গ্রামীণ খেলার বেশ ক'টিই উৎসবে রূপ নেয়। এসব গ্রামীণ খেলার বেশকিছু আজো গ্রামগঞ্জে প্রচলিত আছে। আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো আমাদের লোকজ খেলায় ব্যবহৃত নানান ছড়া ও শিলকী। সেসব ছড়া ও শিলকী থেকে কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো—

থাপ্পি খেলায় ব্যবহৃত ছড়া—
এলকড়ি বেলকড়ি তিনকড়ি দাসী
শ্যামের উক্কা নলের বাঁশি
শ্যাম গেল নদীয়াপুর
তুইল্যা আনলো চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আয়ে (বর আসে) আনন্দে।

হাডুডু খেলায় ব্যবহৃত অজস্র ছড়া থেকে-
হাডুডু কানাইয়া নৌকা দিলাম বানাইয়া
নৌকা যদি লড়ে
কিল খাইয়া মরে
মরে মরে ...
মালাই খেলায় ব্যবহৃত ছড়া—

(তর্জনি তুলে) : এইডা কি?
: বলাই।
: এক ডুবে পালাই।
লোক খেলায় ব্যবহৃত আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ছড়া নিচে দেওয়া হলো—
পলাপঞ্জি খেলার ছড়া—
এলাটিন বেলাটিন ফরটি ফোর
এক লাঠি চন্দন কাঠি
চন্দন বলে কা কা
ইচিক বিচিক সিচিক চা
প্রজাপতি উড়ে যা।
শিশু ভোলানো খেলার ছড়া—
আমাদের বাড়ি দোতলা
তাতে আছে কলের গান
বউ আইনা দেও খেলা করি
বউয়ের মাথায় ঝাকড়া চুল
কোথায় পাবো গেন্দাফুল
গেন্দাফুলের গন্ধে
জামাই আইলো আনন্দে।
ঘঙ্গি ঘঙ্গি লাটুকা
মইষ মরে টাটুকা
মইষের তেলে রং বাত্তি জ্বলে
ধান ডি কেমন? —চিডা চিডা।
তোমারে কেডা মারছে? — পেবি।
পেবিরে আইন্যা দেও গলাত ধইরা টিপি টিপি।
: হিচকলিরে হিচকুলি কই যাইবে? — পুবে।
: পুবে কেরে? — ধান দেখতাম।
: ধান ডি কিরহম? — ছড়া ছড়া।
: চাউল ডি কিরহম? — বগুলার পাখ।
: সুনার গাঙ্গে পড়বে না রূপার গাঙ্গে পড়বে? —সুনার গাঙ্গে/রূপার গাঙ্গে।

[ছড়া শেষে শিশু উত্তর বলবে। সোনার গাঙ্গে বললে ডান দিকে রূপার গাঙ্গে বললে বাম দিকে ফেলে দেয়া হবে। এ খেলাটি বিছানায় শুয়ে খেলা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় জন পা ভাঁজ করে শোবে। ছোট জন পায়ের পিঠে বসবে বড়র হাঁটু জড়িয়ে ধরে। পা দোলাতে দোলাতে ছড়াটা বলা হবে এবং শেষে ডানে অথবা বাঁয়ে ফেলে দেয়া হবে। ছড়াটির ভিন্ন একটি রূপও প্রচলিত আছে।]

বন্দি বন্দি খেলার ছড়া—
-গোয়ালরে ভাই গোয়াল
-কি কসরে ভাই গোয়াল
-তর মইষ কই ?
-বাথানে
-খায় কি ?
-ধানের নাড়া
-হাগে কত ?
-উড়ি উড়ি
-মুতে কত ?
-গাঙ্গ ভাসা
-তর মইষে দুধ দেয় কত ?
-আড়াই আড়াই
-এত দুধ কেডা খায় ?
-রাজায় খায় প্রজায় খায় আর দুধ দেওয়ান গঞ্জে যায়॥
-তর মইষে যে আমার খেত খাইছে ?
-দশটার মধ্যে একটা বাইন্দা ফালা।
যে কোন খেলার দল গড়ার জন্য ছড়া-
ডাক ডাক বেলী
-আয়রে ভাই খেলি
-ঘাস না মাটি ?
-মাটি।
ডাক ডাক কিসকো ডাক ?
-হামকোমারি তুমকো ডাক
-ঘাস না মাটি ?
-মাটি।
ফুলবিরোধ খেলার ছড়া—
১ম দল : আমরা ফুল তুলতে যাচ্ছি যাচ্ছি হে
২য় দল : তোমরা কি ফুল তুলতে যাচ্ছো যাচ্ছো হে
১ম দল : আমরা শেফালী (বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়াড়ের নাম) ফুল তুলতে
যাচ্ছি যাচ্ছি হে।
২য় দল : তোমরা কাহাকে পাঠাইবে?
১ম দল : আমরা লিলিকে পাঠাইবো (নিজ দলের একজনের নাম)।
অতঃপর শেফালী ও লিলির মধ্যে পরস্পরের হাত ধরে টানাটানি শুরু হবে। দাগের দু'পাশে দাঁড়িয়ে যে নিজের দিকে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে টেনে আনতে পারবে তার জয় হবে। এভাবে একপক্ষের সব খেলোয়াড়কে নিয়ে আসতে পাড়লে এক গেম দেয়া হবে।
বুড়ি বন্দি খেলার ছড়া—
-আমার ঘরে কে রে ?
-আমরা খোকা।
-কিসের জন্য ?
-আমের ঝাকা।
-খাসনা কেন ?
-দাঁতে পোকা।
-বিলাস না কেন ?
-দুরু বোকা ! দুরু বোকা !
এরপর ঘরের মালিক দম দিয়ে বালক/বালিকা দলকে তাড়া করবে। দম না ফেলে যাকে ছুঁয়ে দিতে পারবে সেই হবে পরবর্তী বুড়ি।
থাপ্পি খেলার আরো ছড়া—

ফুলে ফুলে ফুলনটি
একেতে দোলনটি
একেতে তেলনটি। জামো জামো জামোটি
বকুল বকুল বকুলটি
পঞ্চে পাখা তোমার মুখে ঢাকা
ছয়ে রেখা সাতে শোলক বলা
আটে পঙ্খী উড়া নয়ে নব্বই জোড়া
দশে পড়লো জোড়া
এগারোয় একটি
বারোয় ঝাপটি
তেরোয় তেসরি কাটা
চৌদ্দয় রূপার বাটা
পনেরোয় পানের খিলি
ষোলয় ঝাপটি তুলি।

[পাঁচ গুটি দিয়ে থাপ্পি খেলা খেলে থাকে দু'জনে। থাপ্পি খেলায় অন্যরকম ছড়ার প্রচলনও আছে। এলাকা ভেদে ছড়া পরিবর্তন হয়ে থাকে।]

চাপিলা-চুপিলা ঘন ঘন মাসিলা
রামের হুক্কা নলের বাঁশি
কে কে যাবি কামার বাড়ি
কামার বাড়ির হুক্কাখানি ক্ষিরে আনে গরম পানি।
উক্কুনি মালা যুহুনি ষোল কডি বারনি
ক-ছেড়ে কাউয়া কার হাতে কড়ুরি?
[হাতে গুটি রেখে শনাক্তকরণ।]
গাছুয়ারে গাছুয়া গাছে ক্যানে? — বাঘের ডরে।
বাঘ কই? — গাছের তলে।
তরা ক ভাই? — ছয় ভাই।
এক ভাই দিবে? — ছইতরলে নিবে।

[ঈশ্বরগঞ্জ-সোহাগী অঞ্চলের ছেলে মেয়েদের খেলা।]
কুমড়া পাতা ডুগডুগ খাইয়া যারে বান্দির পুত।
[হাডুডু খেলায়]
হলদি খেতে কাওয়ার গু হা-হু হা-হু .....
[হাডুডু খেলায়]
এমনি আরো অসংখ্য ছড়ার ব্যবহার খেলার নানা পর্যায়ে হয়ে থাকে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে :আচার-অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকতা বিচারে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ের বৈচিত্র্য ও কর্মযজ্ঞ অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে বিস্তৃত। বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদনের ধারাবাহিকতায় পাত্র/পাত্রী নির্বাচন অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের সাথেই সাযুজ্যপূর্ণ; কিন্তু পাত্র/পাত্রী নির্বাচন হয়ে গেলে বিয়ের জন্য যে আচার-অনুষ্ঠানের শুরু সেখানেই ব্যতিক্রম। হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন ছেলে অথবা মেয়ের বিয়ে সম্পাদনে যেসব আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয় তার ধারাবাহিক বর্ণনা উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। এসব আনুষ্ঠানিকতায় বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু পার্থক্যও দেখা যায়। সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে এখানে কেবল আচার-অনুষ্ঠানের নাম উল্লেখ করছি। পানোখিলি, মঙ্গলাচরণ, মায়ের পূজা (অধিবাস), বনদুর্গাপূজা, বিধিশ্রাদ্ধ, জল আনতে যাওয়া, সোহাগডালা, দধিমঙ্গল, কলা তলায় বিয়ে, মেয়েকে কলা তলায় আনার পর মন্ত্র পাঠ হবে এবং কনের বাবা, দাদা-কাকা-মামা একজন কন্যাসম্প্রদান করবেন। সম্প্রদানের পর সাতপাক ঘোরা। বর নিজের আসনে বসে থাকবে, কনেকে নিয়ে কনের দিদি-বৌদিরা সাতপাক ঘুরবেন। সাতপাকের পর মালাবদল। পরস্পরের গলার মালা তিনবার পরস্পরকে পরিয়ে দেবে। মালাবদলের পর শুভদৃষ্টি, বর-কনে পরস্পরের দিকে তাকাবে এবং শুভদৃষ্টির মাধ্যমে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হবে। বিয়ে শেষ হবার পর বর-কনেকে ঘরে নেয়া হবে। ঘরে পাশাখেলা হবে, মেয়েকে ধান তুলতে দেয়া হবে, ছেলেকে পানোখিলি অনুষ্ঠানে কুটে রাখা চালের পায়েশ খাওয়ানো হবে। পাশাখেলায় কড়ি তোলার সময় যদি শব্দ হয় তবে নবদম্পতির জীবন কলহপূর্ণ হবে বলে ধারনা করা হয়, আর যদি শব্দ না হয় তবে সংসার হবে শান্তিপূর্ণ; মেয়ের ধান তোলার সময় পারিপাট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে মেয়েকে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী বিবেচনা করা হয়। বিয়ের নানা আনুষ্ঠানিকতার সাথে যুক্ত হয় গান এবং মেয়েলিগীত। বিয়ে উপলক্ষে প্রকাশনা : বিয়েতে আমন্ত্রণপত্র মুদ্রণের আয়োজন মুদ্রণশিল্প বিকশিত হওয়ার পর থেকেই চালু হয়ে আজও তা প্রচলিত আছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে বিয়ের আমন্ত্রণপত্রেও এসেছে বৈচিত্র্য। আমন্ত্রণপত্রে হিন্দু-মুসলিম বিয়েতে যেমন আছে সনাতনী গৎ, পাশাপাশি আছে বৈচিত্র্যও। একসময় শহুরে মধ্যবিত্তের বিয়েতে 'প্রীতি উপহার', 'ভক্তি উপহার' মুদ্রণের রেওয়াজ ছিল, যা আজ কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে। শহরাঞ্চলে সত্তরের দশক পর্যন্ত এ রেওয়াজ চালু থাকলেও ইদানিং এ জাতীয় প্রকাশনা হতে দেখা যায় না। গ্রামগঞ্জে এ ধরনের প্রকাশনা নব্বইয়ের দশকেও কিছু চালু ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রামেও এ ধরনের প্রকাশনা হতে দেখা যায় না। এ ধরনের প্রকাশনা হিন্দু-মুসলিম দুই সমাজেই দেখা যেতো; 'প্রীতি উপহার'- 'ভক্তি উপহার' অলঙ্করণ, বাক্যবিন্যাস এবং শব্দচয়নেও দুই সমাজের প্রকাশনায় প্রায়শ কিছু মিল দেখা যেতো। প্রেসগুলোতে সংরক্ষিত নমুনা থেকেই সাধারণত এসব প্রকাশনা পুনর্বিন্যস্ত হওয়ার কারণেই হয়তো এমনটি হয়ে থাকবে। এসব প্রকাশনায় নানান রকমের ছড়া মুদ্রিত হতো এবং নবদম্পতির মঙ্গল কামনা থাকতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মুদ্রিত পীতি উপহার/ভক্তি উপহার জোরে জোরে আবৃত্তি করে শোনানো হতো।

বিয়ের গান মেয়েলী গীতঃ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিয়ে অনুষ্ঠনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন গীত গাওয়া হয়। এসব গীত সাধারণত মেয়েরাই গেয়ে থাকে। বিয়ের গীতের বৈচিত্র্য সামান্য তুলে ধরতে চেষ্টা করছি—
গায়ে হলুদের গীত—

ভাবীজান বুবুজান দুলুনীরে মেন্দি দ্যা সাজাই
যখন-না মেন্দির গাছ রোওয়া হৈল
কত মাউগে ঠিগাইর কথা কৈল
যখন মেন্দির একনা পাতা ধরল
তখন সাধুর (বরের) কিবা মনে পড়লো
যখন-না গাছ পাতায় পাতায় ভরলো
তখন সাধুর কইন্যারে মনে পড়লো।

গাঙ্গের পাড়ে তাল গাছ ঝিলিমিলি করে
শোভাজানরে বিয়া দিয়াম সামনের শুক্কুর বারে।
আরচি ভইরা মিছরি দিয়াম দাঁতের শোভা লাগে
কটকি ভইরা সিন্দুর দিয়াম কপাল চডক মারে
বোতল ভইরা জিগুস দিলাম চুল বাইয়া পড়ে।

তুলগো মেন্দি, তুলগো মেন্দি
তুইল্যা মেন্দি জোড় কুলা সাজাইয়া (২)
বাটক মেন্দি বাটক মেন্দি
বাটক মেন্দি জোড় পাডা ফেসিয়া গো (২)
যাওরে মেন্দি যাওরে মেন্দি
যাওরে মেন্দি আমার সাধুর তালাসে (২)
তোমার সাধু কেমনে চিনবাম
আমার সাধুর হাতে বাটিল মেন্দি (২)।
তুইল্যা হলদি, তুইল্যা হলদি
তুইল্যা হলদি জোড় কুলা সাজাইয়া (২)
বাটক হলদি বাটক হলদি
বাটক হলদি জোড় পাডা ফেসিয়া গো (২)
যাওরে হলদি যাওরে হলদি
যাওরে হলদি আমার সাধুর তালাসে (২)
তোমার সাধু কেমনে চিনবাম
আমার সাধুর বাটিল হলদি (২)

বরের প্রস্তুতি ও সাজ-সজ্জার গীত-—
আগে দু-না কইছলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে ভাও অইচ দাঁড়ি মুছ কামায়া
আগে দু-না কইছলা সাধু না করিবা বিয়া
অহন কেরে পাউডার লাগাও আয়নার পায় চায়া।
আগে দু-না কইতা কথা মুহেরে কুচকায়া
মুচকি মুচকি আস অহন বিয়ার-না বাস পাইয়া।

উড়ে পঙ্কি আজারে উড়েগো পঙ্কি বাজারে
পঙ্কি উড়েগো আমার বানিয়ার দুকানে
ছেড়া যবর উলাইস্যা ছেড়া যবর বিলাইস্যা
নাক ফুল কিনে গো ছেড়া বাছিয়া বাছিয়া
ছেড়ি যবর অমুহি ছেড়ি যবর ঠমুহি
নাকফুল মিলেগো ছেড়ি ফিকিয়া ফিকিয়া
ছেড়া যবর এহায়্যা ছেড়া যবর বেহাইয়া
নাক ফুল আনে গো ছেড়া টুহাইয়া টুহাইয়া।

বিয়ের গীত—

লাল শাড়ি তুলতুল খালাজীর বিয়া
সাদ্দিন ধইরা জামাই আইছে মুকুট মাথাত দিয়া।
নাস্তা দিলে খায়না বিদায় দিলে যায় না
বেলাজা জামাইডা এইরহম কিয়া।

বইন গো বইন কাইন্দ্য না শ্যামের গলা ভাইঙ্গো না
ভাই গেছে নছিবপুর কিন্যা আনবো চম্পা ফুল
চম্পা ফুলের গন্ধে জামাই আইয়ে আনন্দে
খাওগো জামাই বাডার পান সুন্দরীরে করি দান।
সুন্দরী কাঁইখ্যা তেল সিন্দু মাইক্কা
হাডের লুক পাগল অইছে সুন্দরীরে দেইখ্যা।

হাতে লওগো লীলা কাঠারি
মুখে লওগো লীলা সুপারি
হাত বাড়াইয়া তোমার বিয়ার কাবিন।

কাবিন ফালবাম আমি ছিড়িয়া
কবুল দিলাম আমি ঘুরাইয়া
আরো ছয়মাস থাকবাম আমি মায়াজির কোলে বইয়া।
যুদি পাইতাম আমি কটরার বিষ
খাইয়া মরতাম আমি অচম্বিৎ
তেওনা যাইতাম গো মায়া পরের গলা জুইরা।
উত্তরে থুনে আইল রে নাপিত কান্ধে কেন ছাতি
বাইর কইরা দাও ধবল ফিরা বম্প নাপিত পাটিত।
নাপিতেরা সাত ভাই বুইড়া নাপিত বাইত নাই।
চাইল দিলাম ডাইল দিলাম আইন্ধা খাবার খড়ি নাই
সারারাত পহর দিলাম চকিদার দিয়া
পরবাইতের সুম নিবার আইল খেড়কী দুয়ার দিয়া।
ফেইচকা চুইলা মাগির নিগা জাত আরাইলাম।

কোন বা জাইলার ছাইলা গো
মাথা বোঝাই ছাতা গো
কোন বা ধোপার ছাইলা গো
শরীল বোঝাই কেদো গো।
কোন বা ঢুলির ছাইলা গো
ঘারে গজের দাগও গো
কোন বা মুচির ছাইলা গো
হাত পাও কেন কাটা গো
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির শাড়িগো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির জামা গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।
মুখে বাজাই বাঁশি গো
হাতে বুনাই চালুন গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো
সেই চালুনের ভিতর গো
ইতি বিবির সাজের জিনিস গো
কাঞ্চা বাঁশের চালুন গো।

বরপক্ষ : পিডা খাইলাম চিড়া খাইলাম
আরো খাইলাম খাসি
বিয়া কইরা নিতাম আইছি
খেদমতের দাসী।
কনেপক্ষ : পান খায় পান সুন্দরী
কতা কয় ঠারে
পানের জন্ম তারিখ
কুন কুন বারে?
বরপক্ষ : চালুন দিয়া আনুইন পানি
অজু কইর‍্যা লই
হের পরে সবার সামনে আমি
পানের জন্ম তারিখ কই।

নশার মাথায় লাল পাগুড়ি
কন্যার মাথায় কেশ
শিঘ্রী শিঘ্রী বিয়া পরাও
রাইত অইলো শেষ।

বিয়ে শেষে কনে বিদায়ের গীত-

দেওগো দেও, দেও তুমরা কইন্যাওে তুলিয়া
পাডিখানা বিছাইয়া হরযত আলী মিয়া
জামাই সাইজ্যা বইছুইন গো ফাতেমার লাগিয়া॥
সাজিয়া পারিয়া কইন্যা কান্দিয়া লুটায়
বাপে কান্দে মায়ে কান্দে মাটিতে গড়ায়॥
চাচা কান্দে চাচী কান্দে কান্দে মাজু ভাই
বুক থাপ্‌রাইয়া দাদী কান্দে, আমার জুড়ি নাই॥
আরশি কান্দে পশ্‌শি কান্দে দৌড়ে গরে বাইরে
ইকটুদুল্লা ফাতেমা গো যাইবো পরের ঘরে॥

এমনই আরো অসংখ্য গীত লোকজীবনের বিয়ের অনুষ্ঠানে গীত হয়ে থাকে। এসব গীত বিভিন্ন এলাকায় নানান বাণী ও সুরে প্রচলিত আছে। এখনো এসব গীতের অধিকাংশই গ্রামেগঞ্জে খোঁজ নিলে সন্ধান পাওয়া যাবে; কিন্তু হতদরিদ্র এদেশে এসব বিলুপ্ত প্রায় লোক গীতিগুলো সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা বা উদ্যোগ নেই।

মানব জীবনচক্র ঘিরে উৎসব-অনুষ্ঠান : মানব সন্তানের জন্ম, বেড়ে ওঠা, সাফল্য অর্জন, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে নানান সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান। সেসব অনুষ্ঠানের যেগুলোর সাথে লোকজ সংস্কৃতির নিবিড় সংযোগ সেগুলোর নাম উল্লেখ করছি, ষষ্ঠি, মুখেভাত—অন্নপ্রাসন, সিমন্তন্য, সাধ ইত্যাদি। ষষ্ঠি প্রসঙ্গে গীতযোগের কারণে সামান্য বলছি—

ষষ্ঠি : শিশু জন্মের ছয়দিন পর প্রসূতির ঘর, বিছানা, কাপড়-চোপড় ধোয়া, শিশুর মস্তক-মুণ্ডন এবং কিছু আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাকে সন্তান প্রসবের অসূচমুক্ত করা হয়। সাধারণত যে ঘরে শিশুর জন্ম হয় সে ঘরটিকে স্থানীয় ভাষায় 'ছড়িগর' বলা হয়। ছড়িঘরে সকলের প্রবেশাধিকার থাকে না। প্রতিদিন ধোঁয়া দিয়ে ঘরটিকে পবিত্র ও রোগমুক্ত করা হয়, যদিও প্রচলিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীরা কথা বলে থাকেন এবং অস্বাস্থ্যকর আখ্যা দেন, তবু গ্রামেগঞ্জে আজো পুরোনো রীতি প্রচলিত আছে। শহর-নগরে অনেক ধারণাই পাল্টেছে এবং সংস্কার হয়েছে। তবে গ্রাম-শহর সর্বত্রই সন্তান জন্মের ছয়দিন পর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীরা শিশুকে দেখে যাবে এবং শিশুর জন্য উপহারসহ দোয়া-আশীর্বাদ করে যাবে। হিন্দু-মুসলমান-আদিবাসী সকল সমাজেই ষষ্ঠি উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়। স্থানীয় ভাষায় এ অনুষ্ঠানকে হাইট্টারা বা সাইট্টারা বলা হয়ে থাকে। গ্রামেগঞ্জে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ ধরনের গীত পরিবেশনের রীতি প্রচলিত ছিল। 'হাইট্টারাগীত'গুলো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। হাইট্টারাগীতের বৈচিত্র্যও অনেক। নিচে বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত অসংখ্য থেকে সামান্য ক'টি গীতের বাণী উল্লেখ করা হলো-

বাতাসা কটকডা
জিলাপী চটচডা
চাইয়া দেখ চানমুখ হইছে
কত ফটফডা।

আনন্দিত হইলো গো বালির
বিনন্দিত মন
বালির ঘরে উদয় হইছে পুণ্যি মাইয়া (মাইসা) চান গো
ওরে বিনন্দিত মনরে
এই কথা শুনিয়া দাদি হাসে লইয়া মুখে পান
ওরে বিনন্দিত মনরে

হাইট্টারা আয়মুর ঝুম্মুর
ঘাইট্টারা না জাগে (২)
ছেড়ার নানার কথাই আছিন (২)
খারো বাইট্টার লগে ওদদিস নাইকা
দোকানদার সাইরি সাইরি

শব্দে না শুনছিলাম ছেড়ার নানা ধনী
ছিঃ ছিঃ ছিঃ তুওয়াছি
আমরা করবাম কি
এইতা ধনির লাললূতি
গলার মইধ্যে কলসি বাইন্দা
জলে ডুবিছি ॥

বৃষ্টির গান : বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামেই বৃষ্টির প্রার্থনায় ছেলে মেয়েদের গান গাইবার প্রথা চালু আছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনেক গ্রামেই বৃষ্টির গান পরিবেশনের নিয়ম চালু আছে। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে বৃষ্টি না হলে কৃষক জমিতে বীজ বুনতে পারে না। তখন গ্রামের ছেলে মেয়েরা একত্র হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে গান গায়। বিভিন্ন বাড়ি থেকে চাল-ডাল-তেল-নুন-মরিচ-পেঁয়াজ চেয়ে নিয়ে সিন্নি রান্না করে। বৃষ্টির প্রার্থনায় ব্যাঙের বিয়ে দেয় তারা। বৃষ্টির প্রার্থনায় বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব গান গীত হয়ে থাকে তা থেকে কয়েকটি নিচে দেয়া হলো—

আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই
আল্লাহ মেঘ দে ॥
এ বাড়িগর পানি নাই
চিকায় মুতিছে
হাড়ি কলসি ধুইয়া নিয়া
ছিকায় তুলিছে॥
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই
আল্লাহ মেঘ দে।
আসমানের উপর খোদার ঘর
মন্দির মসজিদ তারপর
হায়রে খোদা পানি দে
ক্ষেত পুইড়া গেল যে।
হাইলা রাজারা তের ভাই;
লাঙ্গল ধোয়ার পানি নাই।
বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় রে
ধান পাট জমি জিরাত
পুইড়া যায় পুইড়া যায় পুইড়া যায় রে
বিষ্টি আয় বিষ্টি আয় রে॥
ধান গেল মরিয়া
ধানের ছোবা ধরিয়া
সোনার দেওয়া নামো লো
শরীর গেল ঘামিয়া।

আয় রে বিষ্টি আয়
চইড়া মেঘের নায়
তুই না আইলে ভাই
ক্ষেত খামারের ফসল যে ভাই
রক্ষা নাহি পায়।

লোকবিশ্বাসে ব্যাঙ বৃষ্টি দেবতার স্ত্রী, স্বামী সমস্ত উদ্ভিদ জগতের কর্তা, তাদের মিলনে ক্ষেত উর্বর হবে; তাই বৃষ্টির কামনায় ব্যাঙ বিয়ে দেয়। গীত হয়—

আম পাতা লড়ে চড়ে
কাডাল পাতা ঝরে
এক ফোডা পানির লাইগ্যা
কাইন্দা কাইন্দা মরে।
আল্লাহ মেঘ দে পানি দে
ছায়া দে রে তুই॥

একটি নির্দিষ্ট স্থানে চার কোনায় চারটি কলা গাছ পুঁতে তাতে রঙিন কাগজ মুড়ে ব্যাঙ বিয়ের আসর বসানো হয়। সেই আসরের মধ্যবর্তী স্থানে গর্ত করে পানি দিয়ে পূর্ণ করে গর্তে একটি ব্যাঙ বেঁধে রাখা হয় এবং মেগে আনা চাল-ডালের খিচুরি রান্না করে নিজেরা খায় এবং অন্যদের খাওয়ায়। মাগনের সময় ছেলে মেয়েরা যে গান গায় তা নিম্নরূপ—

ব্যাঙের ঝিয়ের বিয়া
ষোল্ল মোরগ দিয়া
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা
আম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
তেওনা পড়ে ম্যাঘের পানি
জাম পাতা দিয়া দিলাম ছানি
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা
ব্যাঙাজীর বিয়া
মাথলা মাতাত দিয়া
আলের ফলা চাঙ্গো থুইয়া
গিরস কান্দে বন্দে বইয়া
ও ব্যাঙ ম্যাঘ দেইচ্ছা।

ব্যাঙ বিয়ের পর জল কাদায় একাকার করে ছেলে মেয়েরা। গ্রামবাংলার ব্যাঙ বিয়ের এসব লোকাচার বর্তমানে সময়ের এক দুর্লভ দৃশ্য।
লোকবাংলার উল্লেখিত লোকসাহিত্য ছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎসবভিত্তিক নানা ধরনের লোকসাহিত্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।
উৎসবভিত্তিক নাগরিক সাহিত্য : নাগরিক জীবনে লোকজীবনের মতো উৎসবভিত্তিক গান-কবিতা ইত্যাদির প্রচলন না থাকলেও বাঙালির নাগরিক জীবনে আছে ভিন্ন আয়োজন। আমাদের পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য মিডিয়া বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ করে বিশেষ প্রকাশনা, আয়োজন করে নানান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত সেইসব প্রকাশনায় বিভিন্ন উৎসবসংশ্লিষ্ট গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ-উপন্যাস-নিবন্ধ-ফিচার ইত্যাদি মুদ্রিত হয়। তবে প্রকাশিত সেইসব রচনায় উৎসব-সংশ্লিষ্টতা যেমন থাকে, তারচেয়ে বেশি থাকে অন্যান্য অনুষঙ্গ। যদিও সব অনুষঙ্গই পাঠকের বিনোদনকে বিবেচনায় রেখে করা হয়। দেশের অসংখ্য পত্রিকা ঢাউস কলেবরের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করে। সে সব প্রকাশনার সাথে বাণিজ্যিক সম্পৃক্তি যে কম থাকে তা কিন্তু নয়। তবে সে বাণিজ্যের সুবিধা কর্তৃপক্ষ যতটা পায় লেখকরা তার সামান্যও পায় বলে মনে হয় না। লেখকরাও যদি বাণিজ্যের সুবিধায় সামান্য ভাগ পেতেন তবে তাদের জন্যেও উৎসবে নতুন মাত্রা যোগ হতে পারতো। আধুনিক কালের পত্র-পত্রিকার সেসব উৎসব সংখ্যা থেকে আমি কোন উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না; আমি বরং উৎসবসংশ্লিষ্ট একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে এ রচনার সমাপ্তি করতে চাই, যেখানে প্রবাসী বাঙালির উৎসবকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

যদি মনে পড়ে যায় ব্রহ্মপুত্র-শীতলক্ষ্যা-মধুমতি নদীটির কথা
গোমতী-তিতাস-বুড়িগঙ্গা-কর্ণফুলী যদি ভাঙে নীরবতা
উৎসবের কথা ভেবে যদি মনে হয় আছি কষ্ট-বিভূঁয়ে স্বজন ছেড়ে
বেদনার নীলাকাশ আষাঢ়ের কাছে অলক্ষে গিয়েছে হেরে;
জেনো, ব্রহ্মপুত্র খেয়াঘাট এখনো তোমায় মনে করে কাঁদে
এখনো তোমায় কাশবন কাছে ডাকে অদৃশ্য সুতোয় বাঁধে;
ধলেশ্বরী-তিস্তা-পদ্মা-যমুনায় জাগে চর বিরান প্রান্তর
চোখ মুদে বুকে হাত রাখো টের পাবে অপেক্ষায় আছে সমুদ্রবন্দর;
দণ্ডকলস-থানকুনি-ঘৃতকাঞ্চন-বাসক-শুটি স্বাস্থ্যসেবা অনুপান
ভেষজ চিকিৎসা আশৈশব তোমার গ্রামের লোকজ সম্মান;
তোমার নিজস্ব আকাশে এখনো বহুবর্ণ ঘুড়ি অবিরাম-নিত্য ওড়ে
ফেলে যাওয়া প্রতিটি দিনের স্মৃতি তুষানলে অনিঃশেষ পোড়ে।

বোনেরা যখন রাখি বাঁধে ভাইয়ের কব্জিতে ভালোবাসা দিয়ে
প্রেমিক নিঃসঙ্গ রাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রেমিকার স্মৃতি নিয়ে
সন্তানের আলিঙ্গন পেতে হু-হু করে মা-বাবার তৃষ্ণার্ত অন্তর
উতাল বাতাসে যখন হঠাৎ কেঁপে ওঠে দুঃখির পাতার ছোট্ট ঘর;
তোমাকে স্মরণ করে সবুজ গাঁয়ের মাঠ চেনা পরিবেশ
নদী-মাছ-পাখি-শস্যক্ষেত নাম ধরে ডাকে তোমায় দরিদ্র বাংলাদেশ। ঈ
(প্রবাসী বন্ধুর প্রতি)